এক অ-ফ্যাসিবাদী জীবনের পথনির্দেশ

প্রকাশিত হতে চলেছে। বাংলায় অনুদিত, অ্যান্টি ওয়েদিপাউস গ্রন্থের মিশেল ফুকোর ভূমিকা এবং গাইল দেলেউজ-এর নিয়ন্ত্রিত সমাজ-এর উপসংহারের পরের কথা।

সম্ভাব্য মূল্য দশ টাকা। মন্থন সাময়িকী পত্রিকার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 4 16 August 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১৬ আগস্ট ২০১৩ শুক্রবার ২ টাকা

• 'ডাইনি'-র খোঁজ পৃ ২ • চলতে চলতে পৃ ২ • প্রতিবাদ পৃ ২ • ফেলানি পৃ ৩ • উত্তরাখণ্ড পৃ ৩ • ঈদ পৃ ৪ • শ্রীলঙ্কা পৃ ৪ • মেছুড়ে পৃ ৪ • মিশর পৃ ৪

'ছোলা-ময়দা-পেন-খাতা না নিলে চাল গম পাবে না'

অলোক সরদার ও গৌর মণ্ডল, জয়নগর, ১১ আগস্ট •

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে রেশন দোকানগুলির বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই নানান অভিযোগ পাচ্ছিলাম গ্রাহকদের পক্ষ থেকে। গত ১১ আগস্ট ২০১৩ আমরা সরেজমিন তদন্তের জন্য উপস্থিত হই। সুন্দরবন অঞ্চলের একমাত্র পৌরসভা জয়নগর-মজিলপুরের শতাধিক বছরের পুরোনো বড়ো বাজার গঞ্জে। তখন সকাল ১০টা বাজে, শনিবার। স্থানীয় মানুষদের থেকে জানা গেল, সোম ও শুক্রবার হাটের দিন ছাড়া রাস্তার দক্ষিণ দিকের অংশটি ফাঁকাই থাকে। উত্তর দিকের সবজি ও মাছের বাজারে তখন কিন্তু খুব ভিড়।

প্রথমে আমরা উত্তর প্রান্তের একটি রেশন দোকানের সামনে উপস্থিত হলাম। গ্রাহকদের থেকে জানা গেল, এটির মালিক স্থানীয় তাপস মতিলাল। রেশন দেওয়ার কাজ করেন খোকন চক্রবর্তী নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি। জনৈক মহিলাকে রেশন দোকান থেকে বেরোতে দেখে তাঁর কাছেই আমাদের আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের জানালেন —

আমার অন্ত্যোদয়ের লাল কার্ড আছে সপ্তাহে ১ কিলো চাল ২ টাকা দরে আর ৭৫০ গ্রাম গম ২ টাকা দরে পাই। কিন্তু আজ আমাকে বলা হল ছোলা ও ময়দা না নিলে ওই সামান্য চাল গমও দেওয়া হবে না। আমি দেখলাম ছোলা ও ময়দা নিম্নমানের আর তা ছাড়া আমার দরকারও নেই।

এরপর তিনের পাতায়

জিটিএ নয়, গোর্খাল্যান্ড রাজ্যই চাইছে দার্জিলিং পাহাড়বাসী

জনতা কার্ফুর প্রথম দিন ১৩ আগস্ট শুনশান দার্জিলিংয়ের রাস্তা।

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১৫ আগস্ট •

একটি বেসরকারি টিভি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে দার্জিলিংয়ের এক পাহাড়ি যুবকের চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হওয়া নিয়ে পাহাড়বাসীর গোর্খাল্যান্ড আবেগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ২০০৭ সালে। আগের দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল ভেঙে ফের জেগে উঠেছিল গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন, রাতারাতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল নেতৃত্বদায়ী সংগঠন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এবার শেষ জুলাই-এ অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরির প্রক্রিয়া গণমাধ্যমে আসার পর থেকেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ফের সরব হল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের রাজ্য দার্জিলিং-এর পাহাড়বাসী।

এরপর তিনের পাতায়

'আব্বা বাড়িক নাই, জেলোট'

রেহানা বারোই, কোচবিহার, ১৪ আগস্ট •

ক্লাস শুরু হল, প্রতিদিনের মতো প্রথম শ্রেণীর নাম ডাকার পর হাতের লেখা জমা নেওয়ার পালা। সাগরি পরভীন প্রায় মাসখানেক পর স্কুলে এল। জিজ্ঞেস করলাম, খাতা কোথায়? উত্তর এল একটু অসহায়ভাবে, মোর খাতা নাই। বললাম, ও শ্যাষ হইয়া গ্যাছে। তোমার আব্বা কবে নয়া খাতা কিনি দিবার কইবেন? 'মোর আব্বা বাড়িক নাই'।

এই গ্রামের ৭০ শতাংশ মহিলা ও পুরুষ বা ছাত্রছাত্রীদের বাবা মা উভয়েই পাকস্থলীর টানে দিল্লি যায় কাজ করতে। তাই ভেবে বল্লাম, কোটে গেইছে, দিল্লি? মেয়ের চোখে জল ছলছল। বলছে না কথা। আর একটি মেয়ে কুলসুম বলল, উয়ার আব্বা জেলোট। কোথাও একটা ছন্দের বিরতি ঘটল, কষ্ট হল মনে। সাগরিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আব্বা জেলোট ক্যানে মাও। বলল, নদী দিয়া গুয়্যা (সুপারি) পার কইরবার ধরছিল। সেলা পুলিশ ধরি নিয়ে গেছে। কুন পুলিশ? আমার এথাকারে পুলিশগুলা ধরি টাউনের জেলোট থুইছে। এখানকার পুলিশ মানে বিএসএফ। সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আর কথা না বলে, দুটো খাতা ও কলম এনে সাগরিকে দিলাম।

টিফিনের সময় সাগরির বড়োভাই আরবাজকে ডেকে বললাম, তোমার আব্বা বলে জেলোট? বলল, হিঁ। কদ্দিন হয়? একমাস। কী হইছিল মোক একনা খুলি কন তো বাপ। আরবাজ বলল, ওর বাবা মা অনেক দিন ধরেই দিল্লিতে কাজ করতে যায়।

এরপর তিনের পাতায়

সীমান্তে প্রশাসনের সহায়তায় গরু পাচার চলছে, দু-বছর ধরে বলে কোনো লাভ হয়নি

প্রতিবাদকারীদের ওপর মিথ্যা মামলা, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি

১০ আগস্ট, আকতারুল হোসেন মল্লিক, থানারপাড়া গ্রাম, নদিয়া •

নদিয়ার করিমপুর ২নং ব্লকের থানারপাড়া থানার সামনে দিয়ে প্রতিদিন শতশত গরু পাচার হচ্ছে। লরিতে করে গরু নিয়ে পণ্ডিতপুর গ্রাম হয়ে দোগাছি গ্রামের মধ্য দিয়ে করিমপুর হয়ে বাংলাদেশ পার হয়ে যাচ্ছে। এই থানারপাড়া থানার এলাকার মধ্যেই নতিডাঙা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমাদের ব্লকের হাসপাতাল আছে, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল আছে। ওখানে লরিগুলো দাঁড় করিয়ে টাকা তোলা হয়। এতে বাধা দিতে গেলে পঞ্চায়েত প্রধানকে মারধোর করে, অপমান করে। তাতে প্রধান ৯ জুন ২০১১ তারিখে একটা কেস করেন। এই কেস করার পরেও আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, গরু পাচার বন্ধও হয়নি। তখন আমরা ওই থানার ওসিকে দায়ী করে প্রচুর মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করি। নদিয়ার জেলাশাসক ও সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, সিআই-করিমপুর সার্কেল এবং নতিডাঙা ১ ও ২নং পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে আমরা একটা মাস-পিটিশন দিই। এতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

মাস-পিটিশন দিতে যখন সিআই-এর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, আমরা এতদূর থেকে গাড়িগুলো আটকাতে পারি না। আপনারা গ্রামের মানুষ গাড়িগুলো আটকে দিয়ে আমাদের খবর দিন, আমরা ব্যবস্থা নেব। আমি ২৮ আগস্ট ২০১১ সকাল দশটার সময় থানারপুর থানার ওসিকে ফোন করে বিষয়টা বলি। তিনি আমাকে প্রাণে মেরে দেওয়ার সরাসরি হুমকি দেন। আমি হুমকি পেয়ে আর দশ মিনিটও অপেক্ষা করিনি। দেবগ্রামে আমার পরিচিত এক আইনজ্ঞর কাছে চলে আসি। তাঁর পরামর্শ নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি কলকাতায়। কলকাতায় কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে ই-মেল করে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুরো বিষয়টা জানাই। স্থানীয় যারা প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল, আমার চলে আসার পর তারা যখন ঘটনাটা জানতে পারে, ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ওইদিনই তারা করিমপুর থেকে সিকি কিলোমিটার দূরত্বে গোমাখালিতে একটা গরু বোঝাই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমি কলকাতায় তৎক্ষণাৎ খবরটা পেয়ে যাই এবং রাত ১২টা ১৭ মিনিটে সিআই-কে ফোন করি। সিআই বলেন, 'আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি'।

পরক্ষণেই আমার কাছে একটা ফোন আসে। থানারপাড়ার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদী মানুষকে মারধোর করে গরু বোঝাই গাড়িটাকে পার করিয়ে দিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে একটা মোটর সাইকেল, মোবাইল আর দু-হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে একটা কেসও থানাতে রুজু করা হয়।

পরদিনই কিছু করা দরকার। সেই মতো থানারপাড়া থেকে আট-দশজন কলকাতায় চলে আসে। আমি তো আগের দিন থেকেই ছিলাম। আমি ই-মেল করে যেগুলো পাঠিয়েছিলাম, সেগুলোর কপি রাজভবন, রাইটার্সে গিয়ে রিসিভ করিয়ে নিই। রাইটার্সে একজন ব্যক্তি আমাকে বলেন, 'আপনি কালিঘাটে চলে যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনার কথাগুলো বলুন। হয়তো কিছু হতে পারে।' পরদিন আমরা কালিঘাটে গেলাম। সবাইকে ওখানে ঢুকতে দিল না। ওখানে আমাকে বলল, আপনি বাংলায় লিখুন আপনার বক্তব্য। আমি বাংলায় ঘটনাটা লিখলাম। মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল ডিউটি অফিসার এ সি চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন, ঠিক আছে, আপনারা ফিরে যান। আপনাদের জবাব দেওয়া হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার ১৩৮ কিমি বাসে পথ পাড়ি দিতে লাগল ৯ ঘন্টা!

মমি জোয়ারদার, শিলিগুড়ি, ৯ আগস্ট •

প্রত্যেকবছর এই সময়টা এলে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি, কারন আমাকে প্রায়ই শিলিগুড়ি-কোচবিহার সড়কপথে যাতায়াত করতে হয়। বর্ষার শুরু থেকেই রাস্তাগুলো ভাঙতে শুরু করে। মাঝবর্ষায় এসে এমন অবস্থা হয় যে জলভরা গর্তগুলো মৃত্যুফাঁদ হয়ে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে থাকে। অনেক মালিক বাস নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় ওই রুটে বাস চালানো স্থগিত রাখে, ফলে যে বাসগুলি চলে তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রীবহন করতে হয়। আর এই ১৩৮ কিমি রাস্তা যেতে সময় লেগে যায় কম করে ৭ ঘন্টা।

কেন রাস্তার এই হাল হয়, আর কেন কোনো স্থায়ী সমাধান বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও হয়ে ওঠে না — এই প্রশ্নের উত্তর নেই। এখন উত্তরবঙ্গবাসীর বিভিন্ন অভ্যেসের মধ্যে এটাও একটা হয়ে গিয়েছে। দুর্ভোগ চলতে থাকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। গোটা পঞ্চাশ দুর্ঘটনা আর কয়েকবার অকারন পথ অবরোধে মেলা আশ্বাসের পর রাস্তার কাজ শুরু হয় পুজোর আগে, শেষ হয় নভেম্বরে। রাস্তা ঠিক থাকে মে মাসে বৃষ্টি নামার আগে পর্যন্ত।

৫ আগস্ট সোমবার শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার আসব বলে সকাল ৭টা নাগাদ বাসে উঠলাম। ৮.৩০ নাগাদ জলপাইগুড়ি পেরিয়ে তিস্তাব্রিজের কাছাকাছি এসে বাস থেমে গেল। সামনে প্রবল যানজট। বড়োগাড়ি তো দূরের কথা ছোটো গাড়িরও যাওয়া অসম্ভব। কিছুক্ষণ বাসে বসে অপেক্ষা করলাম, বাসের অনেক যাত্রী নিচে নেমেছে, ড্রাইভারকেও দেখা যাচ্ছে না। আমিও নিচে নেমে দেখি কয়েক হাজার গেরুয়া পোশাক পড়া পুণ্যার্থী জল নিয়ে চলেছে জঙ্গেশের মন্দিরের দিকে, শিবের মাথায় ঢালার জন্য। তারা রাতভোর থাকতেই এসে পৌঁছেছে তিস্তাব্রিজের কাছে কয়েকশো ছোটো-বড়োগাড়ি, টেম্পো, বাস প্রভৃতি নিয়ে। আর গাড়িগুলিকে সেখানে রাস্তার ওপর, ব্রিজের ওপর রেখে তীস্তা নদীতে নেমেছেন। স্নান সেরে ঘটে জল ভরে আবার চলেছে মন্দিরের দিকে। ব্রিজ ও তার দুপাশের রাস্তা প্রায় বন্ধ। ফলত ভয়াবহ যানজট।

আর স্বাভাবিকভাবেই ওই যানজটে আটকে পড়া যাত্রীদের নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যাথা নেই। ধর্মের নামে, তাই কেউ প্রশ্নও করে না। পুণ্য অর্জন সবসময়েই যন্ত্রণার হতে হবে, সে নিজের হোক বা অন্যের। বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে পূজা ঈদ এমনকী মাযান পূজার সাথে

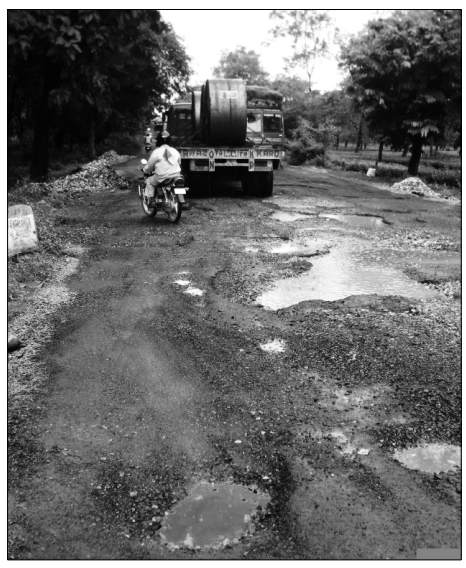

শিলিগুড়ি-কোচবিহার রোডের বেহাল রাস্তার ছবি। সূত্র কালিম্পং অনলাইন নিউজ

রাতভোর জলসার চাঁদাও সংগ্রহ করা যায় জবরদস্তি। আগে এই ব্যাপারটা বাস বা ট্রাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তো বাইক, সাইকেল যাত্রীদেরও ছাড় নেই। ধর্মের স্ট্যাম্প লাগানো আছে, তাই বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে।

ঘণ্টা চারেক পর আবার বাস ছাড়ল। তিস্তাব্রিজ পেরিয়ে খুব ধীরে চলতে থাকা বাসে বসে ততক্ষণে প্রয়োজনীয় কাজ করার আশা ত্যাগ করেছি। একসময়ে জট কাটল, কিন্তু গাড়ির গতি আর বাড়ল না। ততক্ষণে আবার ভাঙা রাস্তায় ঢুকে পড়েছে বাস। পুন্ডিবাড়ি ঢোকার মুখে আবার রাস্তা বন্ধ। মালবোঝাই ট্রাক বিকল হয়ে রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। কোনোমতে একটি গাড়ি চলতে পারে, সেখানেও ছোটো গাড়িগুলি যথারীতি বেনিয়মে ঢুকে গিয়ে যাতায়াতের রাস্তাটাই বন্ধ করে ফেলেছে প্রায়। শেষ পর্যন্ত কোচবিহার বাসস্ট্যান্ডে যখন নামলাম তখন বিকেল ৪টে। এই ১৩৮ কিমি পথ পাড়ি দিতে লেগে গেল ৯ ঘন্টা। ততক্ষণে আমার রাগ, বিরক্তি, ক্ষোভ সব মিলিয়ে একটা নির্লিপ্ত ভাব চলে এসেছে — এটাই আমাদের ভবিতব্য, এটাই আমাদের মেনে নিয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন।

সম্পাদকের কথা

দেশপ্রেমের বুজরুকি

দিল্লির সংসদে সব দলের সাংসদেরা সমস্বরে জানালেন, দ্রুত মু-তোড় জবাব দেওয়া হোক পাকিস্তানকে। তাঁদের প্রতিবাদের ঝড়ে সংসদ সেদিনের মতো মুলতুবি রাখতে হল।

৬ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে পাঁচজন জওয়ান নিহত হওয়ার খবর পেয়েই এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপি থেকে সিপিএম সমেত বিভিন্ন দলের প্রথম সারির নেতারা। ৭ আগস্টের খবরের কাগজ খুলতেই খবরটা চোখে পড়েছে সকলের। প্রথম শিরোনামেই পাঁচজন জওয়ানের দুঃখজনক মৃত্যুর এই খবর। মনে প্রশ্ন জাগে, কী ব্যাপার? কেন এই হত্যা? সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি, পাকিস্তান 'আগে' ভারতকে আক্রমণ করেছে ... ভারত শান্তিবাদী, কিন্তু নিরুপায় হয়ে 'পরে' তাকে পাল্টা আক্রমণ করতে হয়েছে, ইত্যাদি ...। আমাদের দেশপ্রেম, দেশভক্তি, স্বাধীনতার বোধ এই জায়গাটা ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে গত ৬৭ বছর ধরে।

বড়ো বাণিজ্যিক সংবাদপত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের খাতিরের সুবাদে নিমেষে এ নিয়ে অনেক তথ্য তারা জোগাড় করে ফেলে। কিন্তু আমাদের মতো ছোটো স্বাধীন সংবাদপত্র মুশকিলে পড়ে যায়। কারণ কোনোভাবেই সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে সরেজমিন খোঁজ নেওয়ার উপায় নেই। তাই বড়ো কাগজেই খুঁজে বেড়াই প্রকৃত তথ্য। তবে ইন্টারনেটের দৌলতে একটা সুবিধা এখন রয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ঢুঁ মেরে খবরটাকে নানান দিক থেকে যাচাই করে নেওয়া যায়।

৭ আগস্টের বড়ো খবরের ভিড়ে স্টেট্‌সম্যানে দুটো ছোটো খবর ছিল। ১। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর জুলাই–আগস্ট মাসে ভারতীয় জওয়ানরা ১৯ জন সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করেছে। ২। ৬ আগস্ট এই ঘটনাবলীর সম্ভাব্য বদলা হিসাবে ২০ জন ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের ওপর আক্রমণ করেছিল। তারা ছিল সন্ত্রাসবাদী এবং পাক–সেনা। পরে সেদিনই সেনাবাহিনী প্রেস বিজ্ঞপ্তি বদল করে জানায়, ওই ২০ জন ছিল সন্ত্রাসবাদী এবং পাক–সেনার পোশাক পরা কিছু লোক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও এই বিজ্ঞপ্তিকেই সমর্থন করেছিলেন। ৭ আগস্ট বিজেপির চাপে পড়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে জানান, ওই আক্রমণে ছিল খোদ পাক–সেনারাই।

বড়ো সংবাদমাধ্যমের মধ্যস্থতায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং সংসদের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতারা হঠাৎ ৬ আগস্টের পাঁচ জওয়ানের হত্যার ঘটনাকে এত বড়ো করে সামনে নিয়ে এল, মনে হতেই পারে পাকিস্তান একতরফা ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এটা সত্য নয়। আক্রমণের ঘটনাগুলো কিন্তু দ্বিপাক্ষিক।

সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, ২৭ জুলাই পাকিস্তানি সেনা আসিম ইকবাল মারা গেছেন (সূত্র আইএসপিআর)। ৩০ জুলাই ৪ জন পাকিস্তানি অসামরিক ব্যক্তির ভারতীয় সেনার হাতে মৃত্যু (সূত্র ফার্স্টপোস্ট)। ৫ আগস্ট সীমান্তে গুলি বিনিময়ে ১ জন ভারতীয় সেনা জখম এবং ১১ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয় (সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়া)। ৬ আগস্ট ৫ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয় (সূত্র বিবিসি)। ১২ আগস্ট ১ জন পাকিস্তানি অসামরিক ব্যক্তির ভারতীয় সেনার হাতে মৃত্যু হয় (সূত্র এক্সপ্রেস ট্রিবিউন)। ১৪ আগস্ট ৬০ বছর বয়স্ক পাকিস্তানি অসামরিক ব্যক্তির ভারতীয় সেনার হাতে মৃত্যু হয় (সূত্র হিন্দুস্তান টাইমস)।

দেশপ্রেম মানে কি অর্ধসত্যের ওপর ভিত্তি করে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা?

'ডাইনি'–র খোঁজে

শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী, ১৪ আগস্ট •

সজনী হাঁসদাকে প্রথম দেখি তাঁর দিদির সাথে, আমাদের নিতে এসেছিলেন ব্যান্ডেল থেকে পোলবা যাবার তেমাথার মোড়ে। তাঁর নিকষ কালো চোখের তারা যেন বলতে চাইছিল অনেক কিছু, তখনই। ব্যান্ডেল রেল কলোনির একটি কোয়ার্টারে তাঁদের আপাত নিবাস, অনিশ্চিত, আতঙ্কিত জীবন যাপন। কবে কখন তাঁরা আবার বাড়ি ফিরবেন জানা নেই। জানা নেই আদৌ ফেরা যাবে কি না তার আভাস। যদিও আভাস আমরা পেয়েছিলাম পোলবা থানায়, যখন ওসি অসিত দাস জানান, তদন্ত কতদূর বা কেন কেউ এখনও গ্রেপ্তার হল না সেসব বলা যাবে না।

'আমরা এক সচেতন প্রয়াস'–এর পক্ষ থেকে গত ১২ জুলাই ২০১৩ আমরা হুগলি জেলার পোলবা থানার একটি গ্রামে কথিত ডাইনির খোঁজে যাত্রা শুরু করি। আমরা মানে সাধন বিশ্বাস, অনুপম দাস অধিকারি, ফারুক উল ইসলাম, অলোক দত্ত, উদয়াদিত্য ভট্টাচার্য, শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী। কয়েক পর্যায়ে চলে সেই তথ্যায়ণ — জানগুরু, 'ডাইনি', গ্রামের মানুষ — কথা হয় অনেকের সাথে। এখানে আমাদের প্রথম পর্বের বর্ণনা রাখা হল।

সজনী থাকেন পোলবা থানার একটি গ্রামে, গ্রামের নাম রহিমপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত মহানাদ। রহিমপুরে তাঁর বাবার বাড়ি। তাঁর বয়ানে যা জানা গেল — ২০ জুন রাত্রি ১১টা, খাওয়া দাওয়া করে সকলে শুয়ে পড়েছি তখন। বাবা (গোপাল মুর্মু) একটু লেটে শুতে যান টিভি দেখে। সেদিনও তাই। টিভি বন্ধ করে যখন বাথরুমে যাবেন দেখেন বাইরে কয়েকজন ঘোরাফেরা করছে। বাবা জানতে চান এত রাত্রে এখানে কী করছ? তারা বলে, পুকুরে মাছ দেখছি। রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ একদল লোক দরজা ধাক্কা দেয়,বলে এখানে পুজো–আচ্চা হচ্ছে। অথচ আমরা তখন শুয়ে পড়েছি। ওরা সবাই এসেছিল দক্ষিণ পাড়া থেকে। দরজা ভেঙে যারা ঢোকে তারা কেউ সাঁওতাল নয়। সবাই বাঙালি, জাতিতে জেলে, বাগদি, বাঙাল। যদিও সাঁওতালদের সমর্থন না থাকলে এ ঘটনা হয় না। ওরা প্রায় ৩০–৩৫ জন হবে, চিৎকার করে বলতে থাকে, একটা বাচ্চা ছেলেকে ডাইনিবিদ্যায় অসুস্থ করে রেখেছিস, ওখানে চল। আমার বাবা বাধা দিতে গেলে, তাঁকে সজোরে আঘাত করে, বাবার মাথা ফেটে যায়। ভয়ে আমার বৌদি তার ১০ মাসের বাচ্চাকে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ে, ওরা ওইটুকু বাচ্চাকেও রেহাই দেয়নি।

পরে পোলবা থানার অদূরে যে আত্মীয়ের বাড়িতে গোপাল মুর্মু পরিবার নিয়ে বর্তমানে থাকেন, সেখানে আহত শিশুটিকে আমরা দেখি, দেখি রক্তাক্ত গোপাল মুর্মুর ছবি।

গোপালবাবু কাজ করেন কলকাতা কর্পোরেশনে, গ্রুপ ফোর স্টাফ। আমরা তাঁর সাথে কথা বলি কলকাতায়। তিনি বলেন, বছর কুড়ি আগের কথা, গ্রামে তখন রামদাস মুর্মু ছিল মোড়ল, আমার বুড়ি মাকে ওরা 'ডাইনি' বলল। জরিমানা ধার্য হল দশ হাজার টাকা। আমরা তখন খুব গরীব, জরিমানা দেবার ক্ষমতা কোথায়। এই অপবাদের কয়েকদিন পরে আমার মা সারা গ্রামের 'এই ডাইনি বুড়ি' শুনতে শুনতে মনকষ্টে মারা যান। জরিমানা দিতে না পারায় আমাদের গ্রামের বাইরে বের করা হল, তখন থেকে আমরা মোড়লের শাসনের বাইরে। বছর আটেক আগে আমাদের পাড়ার কয়েকজন (নিখিল সরেন, বৈদ্যনাথ মুরমু, নির্মল সরেন) হটাৎ আমাদের কিছু না জানিয়ে আমাদের বাড়ির অদূরে ক্লাব তৈরি করতে শুরু করে। আমার জমির কিছু অংশ তাতে ঢোকানো হয়। ক্লাব–এর নাম রহীমপুর গাঁতে গাওতা। বাধা দিই আমি,দরখাস্ত করি তখনকার প্রধানের কাছে, শেষে তাঁর হস্তক্ষেপে ক্লাব তৈরি বন্ধ থাকে। সাঁওতাল সমাজের কাছে আমরা এমনিতেই সমাজচ্যুত, এ ঘটনার পড়ে আমরা আরও একঘরে হয়ে যায়। ইতি মধ্যে আমি চাকরি পাওয়াতে সচ্ছলতা আসে সংসারে। কিছু ধান জমি কিনি। বিভিন্ন সময়ে আদিবাসি সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধেও বলতে থাকি, এই প্রথা আমার মা'কে কেড়ে নিয়েছে। ওদের রাগ বাড়তে থাকে। রাজকবি মুরমু বিত্তবান লোক, তার নজরে আমার সম্পত্তি। শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়াতে অসীম ক্ষমতাধর। সমাজের বর্তমান মোড়ল লক্ষণ মুর্মুরও বিষ নজরে আমার পরিবার।

ঘটনার দিন রাত্রে গোপাল মুর্মুর বড়ো ছেলে গোবিন্দ বাড়িতে ছিলেন না, কর্মসূত্রে চেন্নাইয়ে ছিলেন। স্ত্রীর ফোনে সব জানতে পেরে তিনিই প্রথম চেন্নাই থেকে পোলবা থানায় ফোন করেন। পোলবার সিঙ্গি পাড়ায় আত্মীয়, গুরুচরণ হেম্ব্রমের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার পর থেকে গোবিন্দ ফিরে এসেছেন, আছেন পরিবারের সাথে। তিনি বলেন, আমি ফোন করা সত্ত্বেও পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে রওনা দেয়নি, তারা পৌঁছায় যখন, ততক্ষণে ওরা সজনীকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। সজনীর স্বামী কোনোক্রমে পালিয়ে গিয়ে খবর দেয় পুলিশকে। ঘটনার পরদিন (২১ জুন ২০১৩) একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়, যাতে ঘটনাকে লঘু দেখানোর চেষ্টা থাকে। ইতিমধ্যে কয়েকটি বড়ো মিডিয়াতে আমাদের ঘটনাটি খবর হয়। ৫ জুলাই ২০১৩ তারিখে রাত্রি ১১টায় পোলবা থানার বড়োবাবু, অসিত দাস ডাক দেন, বলেন এফআইআর নেওয়া হবে। জায়গা কম বলে অভিযোগ সংক্ষিপ্ত করতে বলেন। অত রাত্রে স্বাভাবিকভাবেই আমার বাবা খুব চাপে ছিলেন, বড়োবাবুর কথামত যে এফআইআর করা হয় তাতে আমাদের দাবি স্পষ্ট হয় না।

সজনীকে প্রায় অর্ধনগ্ন করে রাজকুমার বৈদ্যর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ যখন তাকে উদ্ধার করে তখন তার পরনে ছিল ছেঁড়া কাপড়। সে রাত্রির কথা বলতে এখনও শিউরে ওঠেন সজনী। বলেন — আমার তুতো দিদি হাঁসি হাঁসদা আমাদের বাড়িতে ছিল, তাঁকেও চুলের মুঠি ধরে মাটিতে আছাড় মারে, ইট দিয়ে ডান পায়ের পাতায় সপাটে মারে। আমার বৌদি পূর্ণিমা মুর্মুকে তাঁর কোলে থাকা ১০ দিনের বাচ্চা সহ খাটের তলা থেকে হিড়হিড় টেনে আনে, বাচ্চাটাকেও রেহাই দেইনি ওরা। সজনী বলেন, সবাইকে ঠিক চিনতে পারিনি, তবে যে কজনকে চিনেছি তারা হল, কার্তিক রায়, শিবনাথ পাত্র, স্বপন বিশ্বাস, মিঠুন বিশ্বাস, রাজকুমার বৈদ্য, দুলাল সরকার, রুইদাস সরকার, অনিল রায়, অনন্ত মালিক ইত্যাদি। ওরা আমাকে মারতে মারতে নিয়ে যায়। আমি বলি, আমার কী দোষ বল, ওরা কোনো কথা শোনে না। ৭–৮ বছরের বাচ্চা রাজীব বৈদ্য, তাকে দেখিনি কখনও, ওরা বলল, ওকে তুই অসুস্থ করে রেখেছিস, ভালো কর। আমি বলি, ডাক্তার দেখাও, শুনে ওরা আবার লাঠি তোলে। আমার বাবা বলেন, আমার মেয়েকে মেরো না। আমি বলি, আমাদের জ্বালিয়ে মেরে ফেলো, আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের সামনে এক রোজা বসেছিল, নাম সম্ভবত মুন্সুল, শুনেছি খন্যানের ইটাচুনা কলেজের কাছে থাকে। সে বলে, বাচ্চাটা নাকি আমার নাম বলেছে। আমি বলি, তাই যদি হয়, তবে বলুক আমার বাড়ি কোথায়, কীরকম দেখতে আমার বাড়ি। কিছু বলে না বাচ্চাটা। দেরিতে হলেও পুলিশ না পৌঁছালে যে কী হত জানি না। মেরেই ফেলত আমাদের।

১২ জুলাই প্রথমে আমরা পোলবা থানায় যাই ঘটনার বিষয়ে জানতে। ওসি অসিত দাস তখন থানায় নেই। উপস্থিত অফিসার বড়োবাবু ছাড়া কিছু বলা যাবে না, একথা জানান। আমরা তাঁর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে বড়োবাবুর সাথে ফোনে কথা বলি। তিনি বলেন, তদন্ত চলছে, এখনই কিছু বলা যাবে না। জানতে চাওয়া হয়, এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হল না কেন? উনি বলেন, এ বিষয়েও কিছু বলা যাবে না। গোপাল মুর্মুর পরিবার এখন কোথায় তা জানতে চাইলে বলেন, আমি জানি না।

পরে আমরা গোপালবাবু ও তাঁর ছেলে গোবিন্দর কাছে জানতে পারি, তাঁরা বড়োবাবুকে বারংবার অনুরোধ করেছেন বাড়িতে ফেলে আসা ধান, চাল, খাদ্যদ্রব্য ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে। আলমারি, ৫০ বস্তা ধান, নগদ টাকা লুঠ হয়েছে তাঁদের, ফিরে পেয়েছেন শুধু ১ বস্তা ধান। বড়োবাবু উল্টে বলছেন, কাউকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কি আমাদের দায়িত্ব? এও বলেন, কেন আপনারা পুজো–আচ্চা করেন? মানে কিনা আমরা পুজো করেই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছিলাম। আমাদের বাড়িতে রাধা–কৃষ্ণ, শিব পুজো হয়, বলুন তা কি অপরাধ? উত্তর দিতে পারিনি আমরা। গ্রামে তাঁদের জমি, বাড়ির ওপর নজর আছে প্রতিবেশী সাঁওতাল বাঙালি সকলের। তাঁরা চলে আসার পর তাঁর বাড়িতে লেখা হয়েছে, গোপালের পরিবারকে আর কোনোদিন গ্রামে ফিরতে দেওয়া হবে না — এই হুমকি এবং তার জমিতে চাষ করতে না দেবার ফতোয়া। পাড়ায় পাড়ায় গণ স্বাক্ষর নেবার পর্ব চলছে। সংখ্যায় কম হলেও কয়েকজন সই করতে চায়নি। তাদেরও গ্রাম থেকে তাড়ানোর হুমকি দেওয়া চলছে।

প্রশ্ন করেছিলাম, গ্রামে কি ফিরতে চান আপনারা? অবরুদ্ধ কান্না আটকে উত্তর দেন সজনী, না, ওখানে ফিরলে বাঁচব না আমরা। ২০ বছর পরেও আমার ঠাকুমার ঘটনা ফিরে এসেছে আবার, এবার আমি। এর পর অন্য কেউ। আমার দিদির ছোট্ট মেয়েটা আমার বাবার কাছেই থাকত, ওখান থেকেই ইশকুলে যেত। হঠাৎ রোগে ভুগে মারা যায় সে। গ্রামের কেউ আমাদের পাশে দাঁড়ায় না, শেষকৃত্য করতে আসে না কেউ। ওইটুকু বাচ্চাকেও ওরা মায়া করেনি। আমরা আর ওখানে ফিরব না। দিনের পর দিন আমরা বাড়ি, জমি থেকে উৎখাত হয়ে রয়েছি অন্যের বাড়িতে। আপনারাই বলুন, কোথায় যাব আমরা?

এর উত্তর আমাদেরও জানা নেই।

চলতে চলতে

জ্যান্ত ইতিহাস

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল •

সকাল সাড়ে সাতটায় চা বিস্কুট খেয়েছিলাম। এখন সাড়ে নটা। বেজায় খিদে পেয়ে গেছে। গাঙ্গুলিপুকুর বাসস্টপের উল্টোদিকে, যেখানে জনস্বাস্থ্যের জন্য 'এখানে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ' লেখা বোর্ডের তলায় সবচেয়ে বেশি আবর্জনা আর চায়ের ভাঁড়ের স্তূপ শহিদনগর কলোনির অধিবাসীদের ঠাট্টা করছে, সেখান থেকে পশ্চিমদিকে একটু এগোলেই কালাদার চায়ের দোকান। দোকানে ঢুকে ঘুগনি আর একটা কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটির অর্ধেক দিতে বলে টেবিলের সামনে বেঞ্চিতে বসতে বসতে খেয়াল করলাম, দোকানে উপস্থিত সকলেই বেশ বৃদ্ধ। তিনজনের মাথাভরা পাকা চুল আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাদা জামাকাপড় দেখে মনে হল 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে'।

সেই তিন বুড়ো আমার সামনে ও পাশে হাতে চায়ের গ্লাস ও সিগারেট নিয়ে গপ্পে মেতেছে। সকলেই বাঙাল ভাষায় কথা বলছে। আমার আরেক পাশেই গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা আরেকজনও বয়স্ক, মাথার পাকা চুলের কলপ উঠে লাল কালো সাদা তিন রঙা ঝাঁপানো চুল নাড়িয়ে তিনিও চা খেতে খেতে বৃদ্ধদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার মুখোমুখি বসা প্রথম বৃদ্ধই বক্তা — এঁর চেহারা খুব চোখা, কপালের কাটা দাগ কোনো অঘটনের সাক্ষী। তিনি বলছেন গেরুয়া পাঞ্জাবিকে, 'ওইদিকে একটা খাল আছিল না, ওর পাশে একটা ডোবা ছিল, তোরা দ্যাখস নাই, ওই ডোবার পাশে সবুজ একটা মাঠ ছিল, ছোটো দ্বীপের মতো, ওখানে আমরা আড্ডা বসাতাম। একখান ছবিও আসে আমাদের উনিশশো একান্ন–বাহান্ন সালে তোলা। সাদা কালোয় ফটো, এখনো কী সুন্দর আসে'।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ পকেটের থেকে পয়সা বার করতে করতে কালাদাকে জিজ্ঞেস করে 'সিগারেটের দাম কত রে?' — '৬টাকা' — 'ওরেব্বাবা, এত দাম!' তৃতীয় বৃদ্ধ একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে 'তুই সিগারেট খাওয়া ছাড়ান দে'. প্রথম জনের গলা শোনা যায় 'এই যে শহিদনগর খেলার মাঠ। ওখানে ধীরেনবাবু দুটো প্লট কইর‍্যা বেচ্যা দিতে ছিল। মাঠে খুঁটি পোঁতা। আমি আর ওই বাবলুর দাদা আসিল না, আরও দুইজন সোজা গিয়া খুঁটি তুইল্যা ফ্যালাইয়া দিসি। কেউ টুঁ শব্দটি করে নাই'। গেরুয়া পাঞ্জাবি বলেন, 'আপনেরা সইলেন বইল্যাই তো অহনও মাঠখান আছে'. প্রথম বৃদ্ধ বলেন, 'সে তো আর কেউ জানে না, ওই আমরা চারজনই জানতাম। সেও ৫৩–৫৪ সালের কথা, তহনকার একখান ফটোও আসে। শহিদনগরের ৫০ বছর পূর্তির সময় ডিসপ্লে করসিল। তার মধ্যে আমার ছবিও আছে।'

ঘুগনি পাঁউরুটি খেতে খেতে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ — এরা সব জ্যান্ত ইতিহাস — যেসব সালের কথা বলছেন সব আমার জন্মেরও আগে। আমারও তো বয়স কম হল না। দাড়ি সব পেকে গেছে, মাথা জোড়া টাক, আমাকে অবশ্য এই বৃদ্ধেরা পাত্তা দিচ্ছেন না — সেদিনের ছোকরা ভাবছেন বোধহয়। আমি শুনছিলাম, কোনো কাউন্সিলর বাবুকে শিখণ্ডী খাড়া করে এই উদ্বাস্তু কলোনির জমি প্লটকে প্লট বেচে দেওয়া হল। 'সে বাবু গুডম্যান হইলে কই হইব, ওসব গুডম্যান কোনো কামের নয়, পার্টির পক্ষে ভালো'। দ্বিতীয় বৃদ্ধ উঠিউঠি করছিলেন। প্রথমজন বললেন, 'প্রবীর তুই জল মরলে বাইর অ'। দোকানের সামনে জমা জলের দিকে তাকিয়ে স্বভাবে গম্ভীর কালাদাও হেসে ফেলল, 'ও তো মরতে মরতে বিকাল হইয়া যাইব'। দ্বিতীয় বৃদ্ধ তৃতীয় জনকে হাত ধরে নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেলেন। দুজনেরই হাতে বাজারের থলে। একজনের প্লাস্টিকের থলে থেকে কুমড়ো আর ঝিঙে উঁকি মারছে। তৃতীয়জনের হাঁটার বেশ ঝামেলা আছে। প্রথম বৃদ্ধ বললেন, 'হেই তোরা হাত দ্যাখাইয়া গাড়ি থামাইয়া রাস্তা পার হ'। তারপর কালাদাকে বললেন 'অর পায়ে অপারেশান হইসে।' বলতে বলতে তিনিও উঠে গেলেন।

আর ওঠা মাত্র গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক মানুষটি লাফ মেরে উঠলেন, 'ওফ এতক্ষণে সিগারেট ধরানো গেল।' আমি হেসে বললাম 'আপনার থেকে কত বড়ো ওরা?' বললেন 'অনেকটা'। আমি বললাম, 'বয়স কত হবে এঁদের? ৭৫–৮০'? হুঁ বলে সিগারেটে তিনি কষে টান দিতেই প্রথম বৃদ্ধ আবার এসে হাজির 'দ্যাখ কেমন ভুল হইসে'। বলে দোকানের মেঝে থেকে মাছের থলেটা তুলে নিলেন। আড়চোখে দেখি গেরুয়া পাঞ্জাবি হাত ঘুরিয়ে চট করে সিগারেট লুকিয়ে ফেলেছেন। প্রথম বৃদ্ধের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল, তিনি বলছিলেন, 'আরে কাল রাতে যা ঝামেলা হইসে। ঝড়ে কারেন্ট চইল্যা গেল। বউ তো কিছু করতে পারে না শুইয়া আসে। আমি তিনখান মোমবাতি জ্বালাইয়া কোনোরকমে খাওয়া সারসি, ওখানেই হাত ধুইয়া সব ফেলাইয়া রাইখ্যা মশারিতে গিয়া ঢুকসি। তাও ভাল, কাল গরমটা কম আসিল।'

কে জানে ওনার বউ হয়তো অসুস্থ। ঘরে গিয়ে উনি হয়তো মাছ কাটতে বসবেন। একটা বড়ো শ্বাস নিয়ে কালাদাকে পয়সা মিটিয়ে উঠে পড়লাম।

প্র থ ম পা তা র প র

গরু পাচার চলছেই

তবু আমার আতঙ্ক কাটে না। আমি বাড়ি না ফিরে কলকাতাতেই আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সবাই মিলে অপেক্ষা করি। আনুমানিক দুপুর তিনটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে আমাকে ফোন করা হয়। ফোনে আমাকে জানানো হল, ওঁরা এসপি–র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাতে জেনেছেন, এটা একটা ফল্‌স কেস। আমরা যেন এসপি–র সঙ্গে কথা বলি। আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আপনারা বাড়ি চলে যান।

পরদিন ছিল ঈদ। আমি বাড়ির পথে রওনা হই। পথেই জানতে পারি, থানার ওসি আমার বাড়িতে গিয়ে হেনস্থা করছেন এবং ভয় দেখাচ্ছেন। আমি ভয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসি। তার পরদিন কলকাতাতেই ঈদের নামাজ পড়ি। পরদিন আবার কালিঘাটে যাই। ওঁরা বলেন, আপনি এসপি–র সঙ্গে দেখা করুন। আমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে এসপি–র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি বলি, আমাদের বিরুদ্ধে ফল্‌স কেস তুলতে হবে; মোটর সাইকেল ফেরত দিতে হবে এবং থানার আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন। আমি গ্রামে ফিরে আসি। মাসের পর মাস কেটে গেল। কোনো ধরপাকড় হল না। মোটর সাইকেলও ফেরত দেওয়া হল না। কেসও তোলা হল না।

আমি আবার বেশ কয়েকবার এসপি–কে ফোন করি। বিভিন্ন সরকারি মহলে যেতে থাকি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠিও আসে। সেখানে বলা হয়েছে যে তদন্ত রিপোর্ট আমাকে দেওয়া হোক। সিআই যে রিপোর্ট করেছেন সেটা ফল্‌স রিপোর্ট — এফআইআর ও চার্জশিটে আকতারুল হোসেন মল্লিকের নাম আছে। কিন্তু আমার কাছে ওগুলোর সার্টিফায়েড কপি আছে, তাতে আমার নাম নেই। গোমাখালি থেকে যে মোটর সাইকেলটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেটা আনক্লেমড প্রপার্টি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। আর ওটা নাকি চুনাখালি থেকে আনা হয়েছে। সেটার জন্য দুটো জিডি নাম্বার। কেসে একবার বলা হয়েছে, পানাগড় থেকে আমি আম ও কলা লোড করে দিয়েছিলাম লরিতে। আর একবার লিখেছে, পানাগড় থেকে আম ও কলা লোড করে ফিরছিলাম। ১১২ নং কেসে তিনটে এফআইআরে তিনরকম ভাষা! আমরা জেলাশাসকের কাছে সমস্ত তথ্য দিয়ে জানালাম, গোটা রিপোর্টটাই ভুয়ো। পরবর্তীকালে তিনি এসপি–র মাধ্যমে আমাকে যে রিপোর্ট পাঠালেন, সেটা মোদ্দা একই রিপোর্ট।

দু–বছর পার হয়ে গেছে, প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা কোনো সুরাহা পাইনি। তাই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে গরু পাচার বন্ধ নেই। শুধু ধরনটা কিছু পাল্টিয়েছে। ভারী ভারী লরি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ম্যাটাডোর এবং ইঞ্জিন–চালিত ভ্যানে গরু পাচার চলছে। গরুগুলোকে বেঁধে গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা মর্মান্তিক। এই লরিগুলো ভোরের দিকে এত বেপরোয়াভাবে চলত, আমাদের ওখানে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যুও হয়েছে। দোগাছি কালিতলা ঘাট পার হয়ে মুর্শিদাবাদ পড়ছে। গরুর চাপে নৌকায় ছাত্রছাত্রী স্কুলে যাওয়াআসা করতে পারত না। তারা ওই ঘটনায় প্রতিবাদ করে। লরির জন্য মাটির ঘর ও রাস্তার ক্ষতি হয়। তাছাড়া যেখানে সেখানে পাহাড়ের মতো উঁচু করে বিচালি ফেলা হয়, সেগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মুর্শিদাবাদের এসপি বদলি হওয়ার পরে অনেকসময় মুর্শিদাবাদ না হয়ে গরু বনগা সীমান্ত দিয়ে যাচ্ছে।

হাগনাগারি গরুর হাট থেকে গরুগুলো লোড করে নেওয়া হয়। যেটা আমাদের প্রশ্ন, বাংলাদেশে গরু পাচার দেখার দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর। অথচ এপারে গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন চাষের জন্য বা প্রয়োজনে গরু কিনে নিয়ে যায়, পুলিশ তাদের হেনস্থা করে এবং টাকা নেয়। বাংলাদেশে গরু পাচার আগেও হত। তবে গত পাঁচ–সাত বছর, বিশেষত বছর তিনেক ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

পরমাণু তেজস্ক্রিয়তা আমাদের জীবনেও কি অভিশাপ বহন করে আনতে পারে?

হিরোশিমা দিবসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন

৮ আগস্ট, শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াবুরুজ •

ওদের চোখদুটি ভয়ার্ত হরিণীর মতো, শিকারির তীর থেকে বাঁচার তাগিদ। কিন্তু মনে আশঙ্কার কালো মেঘ, পালিয়ে বাঁচার নিরাপদ স্থান কোথায়? তার চেয়ে বরং রুখে দাঁড়ানো যাক। ওরা আগামীদিনের মা–জননী। মুখের অবয়বে যেন স্পষ্ট প্রতিভাত, 'আর দেরি নয়, বন্ধ হোক মারণযজ্ঞের এই কারবার'।

৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবস পালিত হল। বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষের অনুষ্ঠান সমগ্র নারীজাতিকে নতুন করে ভাববার কথা মনে করিয়ে দিল।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। কম্পিউটার কক্ষের আলো–আঁধারি পরিবেশে ওদের চনমনে অস্থির ভাবটা সকলের নজর কেড়েছিল। পর্দায় স্লাইডের চিত্র ফুটে উঠতেই ওদের ঔৎসুক্য ক্রমাগত বাড়তে থাকল। কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যপট পাল্টে গেল। সকলেই চুপচাপ, স্তব্ধ সভাকক্ষ। কোথায় গেল সেই চেনা অস্থিরতা? কোন অজানা এক বিপদ ওদের ভীত–সন্ত্রস্ত করে তুলল। ওরা গুটিয়ে গেল। যেন কোনো এক বিভীষিকার মূর্তি ওদের সামনে উপস্থিত। হ্যাঁ, সেই বিভীষিকা আর কিছুই নয়, ১৯৪৫ সালের হিরোশিমা শহরের ওপর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ। ইতিহাসের পাতায় পড়া ছিল, কিন্তু পর্দায় বিস্ফোরণের ভয়াবহ দৃশ্য ওদের প্রাণে সেঁধিয়ে দিল এক নতুন ভয়। সঞ্চালক ইন্দ্রনীল সাহার শত অনুরোধ আর প্রশ্নেও ওরা কেবলই নিরুত্তর।

সঞ্চালকের সুকথনে এল চেরনোবিল, ফুকুশিমায় পরমাণু চুল্লির বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ। দেখানো হল পরমাণু তেজস্ক্রিয়তায় বিধ্বস্ত মানুষ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের ভয়ঙ্কর সব ছবি। একদিকে পরমাণু বিরোধী পৃথিবীর সোচ্চার প্রতিবাদের ছবি, অন্যদিকে ভারতের মতো গুটিকয়েক দেশের ওই চুল্লি নির্মাণে নির্বোধ তৎপরতা। ইন্দ্রনীল সাহা বললেন, পরমাণু চুল্লি তো এক–একটা সাজিয়ে রাখা পরমাণু বোমা! ২০১১ সালে ফুকুশিমায় সেই চুল্লির বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা দেশ–কাল–সময়ের সীমানা অতিক্রম করে উপস্থিত হচ্ছে পৃথিবীময়; উপস্থিত হতে পারে আমাদের দেশেও।

ব্যস, এই শেষ কথাটিতে আলোচনাকক্ষে আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। ছাত্রীদের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল। পরমাণু তেজস্ক্রিয়তা তাদের জীবনেও কি অভিশাপ বহন করে আনবে? তারাও কি বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবে? তারা তো জানে, নিজের শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালেও তাকে ফেলে দেওয়া যায় না। এরকম অভিশপ্ত জীবন সত্যিই কি তাদের সামনে উপস্থিত হবে? সেই সমূহ বিপদ আঁচ করেই শাহিনা, রোজিনা, রেহানারা চুপ করে গিয়েছিল। ওদের চনমনে অস্থির ভাবটা কেটে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে পীড়াপীড়িতে বলেই ফেলল, 'আমরা সুস্থভাবে বাঁচতে চাই। বাঁচাতে চাই আমাদের আগামী প্রজন্মকে। বন্ধ হোক এই পরমাণু কর্মসূচি।'

বেলঘরিয়ায় সমাজকর্মীদের ওপর চলছে নজরদারি আর পুলিশি হেনস্থা

রঞ্জন, বেলঘরিয়া, ১৩ আগস্ট •

রাজ্য সরকার নোনাডাঙা, কামদুনির পর বেলঘরিয়াতেও সমাজকর্মীদের মাওবাদী আখ্যা দিয়ে জেলে হেনস্থা করছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডে কেদারঘাটির সঙ্গে জুড়ে থাকা বিভিন্ন গ্রামে ওষুধ, কম্বল, মোমবাতি, কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিল বেলঘরিয়ার হিমাদ্রি, মৃণালরা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ত্রাণ বিলির সাথে সাথে তারা সাধ্যমতো প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবাও পৌঁছে দেয়। সেখানকার মানুষজন ওদের পেয়ে এতটাই খুশি হয়েছিল যে গ্রামবাসীরা তাদের রাতে ডেকে খাবারও খাইয়েছিল।

এই মৃণাল–হিমাদ্রিদের উত্তরাখণ্ডে রওনা হবার কয়েকদিন আগে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ বেলঘরিয়া স্টেশন এলাকার একটি চায়ের দোকান থেকে আচমকাই তুলে নিয়ে যায়। কোনো আগাম নোটিশ ছাড়াই এমনকী কোনো আরেস্ট মেমো ছাড়াই। পরে থানার আইসি জানান, আপনাদের আমরা চিনি। আমরা ওখানে রেলপুলিশে যেতাম। আপনারা তো ওই অঞ্চলে গল্প আড্ডা করেন, ... আবার ওখানে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট বা কারোর বিপদ আপদে তো এগিয়ে আসেন আপনারাই। ... কিন্তু আপনাদের এভাবে নিয়ে আসতে হল ... কী করব, আমাদের পুলিশ–প্রশাসনের ওপর চাপ রয়েছে।

বেলঘরিয়ার এই রেলস্টেশনে এলাকার বহু বাসিন্দাই গল্প আড্ডা মারে। বয়স্ক–বুড়ো–ছাত্র সকলেই। সেখানে গল্প–আড্ডা করতে আসা অনেকেই ওদের চেনে। ওরা ওই অঞ্চলে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকে। এমনকী রক্তদান শিবিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজেও। এর আগে নোনাডাঙায় বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, এমনকী সম্প্রতি কামদুনি কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলেও ওদের দেখা গেছে। ব্যক্তিগতভাবে ওরা মজদুর ক্রান্তি পরিষদ ও এপিডিআর–এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে।

কিছুদিন আগে রাজ্যের মন্ত্রী মদন মিত্র মহাশয় বলেন, বেলঘরিয়া অঞ্চলে মাওবাদীদের আনাগোনা রয়েছে। এর পর থেকেই প্রশাসনের দাপটে এই অঞ্চলে মেসঘরে ভাড়া থাকা ছাত্র–যুবকদের বসবাসেও অসুবিধা দেখা দিয়েছে। পুলিশি তৎপরতার ভিত্তি কেবলমাত্র মন্ত্রীর দেওয়া সোর্স। মেসকর্তা আর ঘর ভাড়া দেওয়া মালিকদেরও বোঝানো হয়েছে, সকলের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখতে। এভাবে অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একপ্রকার আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারবিরোধী কোনো প্রতিবাদী দেখলেই তাদের মাওবাদী বলে প্রচার করা হচ্ছে, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনিক তরফে। গুজব ছড়িয়ে এলাকায় সন্ত্রাস বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই ঘটনার পর থেকে এলাকার সচেতন মানুষের উদ্যোগে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পুলিশি এই জুলুমের বিরুদ্ধে চলছে পোস্টার, মিছিল, পথসভা।

স্টেশনের খবর

প্রতিবাদ করলে বিপদ কম হয়

যতীন বাগচী, ব্রেসব্রিজ স্টেশন, ১০ আগস্ট •

প্রতিদিনের মতো স্টেশনে ভিড়। হঠাৎ দেখি, স্টেশনের নিচে লাইনের ওপরে তিনটি ছেলে কী করছে। আর স্টেশনের ওপর থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ তা দেখছে। এদিকে শিয়ালদা বজবজ রেলের ডাউন ট্রেনের ঘোষণা হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি লাইনের ওপর সারিসারি পাথর সাজানো। এক মুহূর্ত দেরি না করে চিৎকার করে বলি, এই কী করছ তোমরা ওখানে? শিগগিরি ওগুলো ফেলো। ট্রেন আসছে। ওরা পাথর ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের বলি, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন? এটা কি মজার জিনিস? কোনো বিপদ হলে কত মানুষের প্রাণ যাবে বলুন তো? স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকদের বক্তব্য, ওদের বাধা দিলে গালাগালি করে। আমি ওঁদের বোঝাবার চেষ্টা করি, প্রতিবাদ করুন। দেখুন ওরা তো পালাল এখান থেকে। সবাই যদি একটু সচেতন হই, তাহলে বিপদ কম হয়।

এরপর দেখি ২ ও ৩নং প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে উনুন ধরানো হচ্ছে কাঁচা কয়লা দিয়ে। খুব অবাক লাগে, শিয়ালদা মেন স্টেশনে ঘোষণা হয়, কোনোরকম দাহ্য পদার্থ নিয়ে ট্রেনে উঠবেন না। আর উল্টো দেখছি, ব্রেসব্রিজ রেলস্টেশন দাহ্য পদার্থেই ভরা। চারদিক তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। যাত্রীদের বক্তব্য, এখানে কিছু বলে বিপদে পড়ব। আমরা রোজ যাতায়াত করি। অগত্যা নিজেই এগিয়ে যাই, বলি।

এখানে রেল কর্তৃপক্ষের কোনো রক্ষণাবেক্ষণ নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, কোনো উদ্বাস্তু কলোনির হাটবাজার। পরে আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। উনি নিজের জায়গায় ছিলেন না।

আড়াই বছর পর সামরিক কোর্টে ফেলানি হত্যার বিচার

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১৪ আগস্ট •

কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা গ্রাম খিতাবের কুঠি সংলগ্ন সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া পেরোতে গিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় বাংলাদেশি কিশোরী ফেলানি খাতুন। ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি সকালবেলা কাঁটাতার থেকে ফেলানির ঝুলন্ত দেহ সকলে দেখতে পায়। আড়াই বছর পেরিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অভ্যন্তরে জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্স কোর্টে (জিএসএসসি) এই ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) কোচবিহারের আলিপুর রুটের সোনারি বিএসএফ ক্যাম্পের বিশেষ আদালত কক্ষে এই বিচার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাগজপত্র দেখা হয়েছে। ডিআইজি পদমর্যাদার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অফিসাররাই এই বিচার প্রক্রিয়ার রায় দেবেন। ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল কমিটির বাংলাদেশ শাখার মাধ্যমে ফেলানির বাবা ও অন্যান্য অভিযোগকারীদের কোর্টে হাজির করানোর চেষ্টা চলছে। ১৯ আগস্ট থেকে জিএসএসসি-তে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের বয়ান শোনার সম্ভাবনা আছে।

উল্লেখ্য যে, বিএসএফ-এর দাবি, রাতের অন্ধকারে বিএসএফ আত্মরক্ষার জন্যই গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ফলত ফেলানির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু খিতাবের কুঠির সাধারণ মানুষের বক্তব্য, ফেলানি নিরস্ত্রভাবেই পার হতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

কুর্মালি ও সাঁওতালি ভাষার সেমিনার

অমিত মাহাতো, ঝাড়গ্রাম, ১৩ আগস্ট। প্রতিবেদক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী •

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে সিধু কানহু বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় আয়োজিত হল পুরুলিয়ার এসটিটি কলেজ অডিটোরিয়াম সভাকক্ষে গত ৫–৬–৭ আগস্ট তিনদিন ব্যাপী কুর্মালি ও সাঁওতালি ভাষা সেমিনার। পুরুলিয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ধানবাদ সিংভূম প্রভৃতি জায়গার কুর্মালি ও সাঁওতালি ভাষাপ্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা সেমিনারে অংশ নেন।

আদিবাসী জনজাতিদের সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার উদ্যোগে এনবিটি ছাড়াও মারাং বুরু প্রেস মেচেদা–র কর্ণধার ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, কুর্মালি ভাষাবিদ শ্রীপদ বঁশরিয়ার, ঝুমুর সঙ্গীত রসিক নগেন পুনরিয়ার, বিশিষ্ট লেখক অনন্ত কেসরিয়ার, কবি সাহিত্যিক ও ঝুমুর লেখক সুনীল মাহাতো, রাখোহরি মাহাতো প্রভৃতি গুণীজনের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও সর্বোপরি কুর্মালি ভাষায় সঙ্গীত পরিবেশন ও অনর্গল কুর্মালি সঞ্চালনায় সেমিনারের প্রাণ সঞ্চার ঘটেছিল।

আগামী দিনে কুর্মালি ভাষায় যাতে সিধু কানহু বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন শুরু হয় — একথা উঠে এসেছে সেমিনারে। বর্তমানে কুর্মালি ভাষা পুরুলিয়া ধানবাদ সিংভূম ছাড়া কোথাও চর্চা হয় না। যাতে এই ভাষার প্রসার ঘটে তার জন্য সরকারি প্রয়াসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হল।

প্র থ ম পা তা র প র

রেশন চিত্র

তাই আমি নেব না বলাতে আমাকে চাল গম দেয়নি। (খালি থলে আমাদের দেখিয়ে তিনি বললেন) আমি ফিরে যাচ্ছি। এগুলো অসহায় সাধারণ মানুষের প্রতি জুলুম নয় কি? মাঝে মাঝে বলা হয়, খাতা পেন নিতে হবে আমাদের। ওসব প্রয়োজন লাগে না, কিন্তু না নিলে চাল গম দেয় না। যে মাসে পঞ্চম সপ্তাহ পরে, তখন রেশন দেওয়া হয় না আমাদের সে সপ্তাহের। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায় না বা অপমানজনক কথা বলে।

আরেকটি দোকান। এটির মালিক স্থানীয় সুধীন দাস, জানাল গ্রাহকরা। এখানেও একই অভিযোগ। জানতে চাইলাম, রেশন ইন্সপেক্টররা পরিদর্শনে আসেন? গ্রাহকরা তাঁদের কাছে অভিযোগ জানান? একজন গ্রাহক এর উত্তরে জানালেন, —

প্রায় তিন চার মাস আগে একবার কয়েকজন ইন্সপেক্টর এসেছিলেন পরিদর্শনে। তখন কী করে যেন খবর পেয়ে প্রায় সব রেশন দোকান মালিকেরা হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছিল। পরিদর্শকরা হিসেবপত্র ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার সুযোগই পাননি। কয়েকজন তাঁদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তার শাস্তি হিসেবে তাঁদের দু–সপ্তাহ রেশন দেওয়া হয়নি। মালিককে বলায় মালিক বলেছিলেন, 'যে বাবার কাছে তোমরা অভিযোগ জানিয়েছ সেই বাবারা রেশন দেবে তোমাদের।'

রেশন দোকান সম্বন্ধে মানুষের নানা অভিযোগ, ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসলেও, ভয়ে তাঁরা কিছু বলতে সাহস করেন না। স্থানীয় কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাকে বলেও খুব একটা কাজ হয়নি, তাঁরা জানালেন।

উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের জন্য কি ভাগীরথী–অলকানন্দা নদীতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিই দায়ী?

বিশেষজ্ঞ দল গড়ে খতিয়ে দেখতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

স্যানডর্প-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে, ১৪ আগস্ট •

১৩ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ উত্তরাখণ্ডে অলকানন্দা নদীর ওপর ৩৩০ মেগাওয়াটের শ্রীনগর হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। কিন্তু সেই সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার রায়ের মধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপারে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। অলকানন্দা এবং ভাগীরথী নদী অববাহিকায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির পরিবেশ তথা অন্যান্য বিষয়গুলির ওপর প্রভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে রুরকি আইআইটি থেকে একটি জরিপ করা হয় ২০১১ সালে। সেই সমীক্ষার রিপোর্টটি খুব একটা দরের নয়, জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট — *'আমরা রিপোর্টটি পড়েছি ... ওতে বাঁধ নির্মাণ, টানেল তৈরি, ব্লাস্টিং, পাওয়ার হাউস তৈরি, ভাঙা পাথর কোথায় ফেলা হবে, খনন, জঙ্গল কেটে ফেলা প্রভৃতির ফলে অলকানন্দা, ভাগীরথী এবং সামগ্রিকভাবে গঙ্গার মতো পবিত্র নদীর অববাহিকার ওপর কী প্রভাব পড়বে তা নিয়ে কোনো সামগ্রিক, গভীর সমীক্ষা করা হয়নি।'*

রায়ের কার্যকরী অংশে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন :

১) সুপ্রিম কোর্ট ফের কোনো নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার উত্তরাখণ্ডে আর কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে পরিবেশ ছাড়পত্র দিতে পারবে না।

২) কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক রাজ্য সরকার, ভারতের বন্যপ্রাণ সংস্থা, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় জল কমিশন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সংস্থা তৈরি করে তাদের মাধ্যমে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা চালাতে বলেছে, বিষয় : চালু বা তৈরি হতে থাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির পাহাড়ের পরিবেশ ধ্বংসে ভূমিকা কতটা এবং ২০১৩ সালের জুন মাসের উত্তরাখণ্ডের ট্র্যাজেডিতে এদের দায় কতটা।

৩) ভারতের বন্যপ্রাণ সংস্থা তার রিপোর্টে জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ২৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভাগীরথী ও অলকানন্দা নদী অববাহিকার জৈব বৈচিত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করছে — এ বিষয়টা পরিবেশ মন্ত্রক খতিয়ে দেখুক।

৪) উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ কোর্টকে একটি রিপোর্ট দিয়ে জানাক, তাদের বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকলে তা কীভাবে কাজ করেছে সাম্প্রতিক উত্তরাখণ্ড বিপর্যয়ে।

এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরাখণ্ডে নদীবাঁধ, বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের লাগাতার বিরোধিতা করে আসা অসরকারি সংগঠন 'স্যানডর্প' অবিলম্বে প্রস্তাবিত ২৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, এবং পরিবেশ ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়া ৩০০ মেগাওয়াটের 'অলকানন্দা বদ্রীনাথ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' এক্ষুনি বাতিল করার দাবি জানিয়েছে।

প্র থ ম পা তা র প র

গোর্খাল্যান্ড রাজ্য

একইসাথে, ২০১১ সালের জুলাই মাসে গঠন হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (সংক্ষেপে জিটিএ) সম্পূর্ণ বাতিল করে পূর্ণাঙ্গ গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে একজোট হয়ে গেল পাহাড়ের মানুষ। চাপে পড়ে জিটিএ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা জনমুক্তি মোর্চা ২৯ জুলাই ৭২ ঘন্টা পাহাড় বনধ্ ডাকে। বনধ্-এর দ্বিতীয় দিনে ৩০ জুলাই তড়িঘড়ি রাজ্যপালকে একটি চিঠি লিখে জিটিএ প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেন মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। শুরু হয় মোর্চার ডাকে অনির্দিষ্টকালের পাহাড় বনধ্। এই বনধ্-এ পাহাড়বাসী নিরঙ্কুশ সাড়া দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আধা সেনা মোতায়েন করে। পাহাড়ে আন্দোলনকারীদের ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। ১৪ আগস্ট জেলা পুলিশ সুপার হিসেব দেন, এই পর্যায়ে ৩৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনির্দিষ্টকালীন বনধ্ তুলে নেওয়ার জন্য ৭২ ঘন্টা সময় দেয় মোর্চাকে। ১২ আগস্ট মোর্চার নেতৃত্বে পাহাড়ের আটটি সংগঠন একজোট হয়ে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই আটটা সংগঠন হল, মোর্চা, সিপিআরএম (এটি নয়ের দশকে সিপিএম থেকে বেরিয়ে এসেছিল), অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ, হিল কংগ্রেস এবং হিল বিজেপি (কংগ্রেস ও বিজেপির পাহাড় শাখা, যারা উঁচুতলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে সামিল হয়েছে), গোর্খা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস, গোর্খা রাষ্ট্রীয় নির্মাণ মোর্চা, ভারতীয় গোর্খা পরিসঙ্ঘ। এরা ছাড়াও অংশ নেয় গোর্খাল্যান্ড টাস্ক ফোর্স নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন।

হাইকোর্ট বনধ্ বেআইনি ঘোষণা করার পর জনমুক্তি মোর্চা 'জনতা কার্ফু'-র ডাক দেয় এবং নিজেরা সমস্ত ধরনের পিকেটিং তুলে নেয়। জনতা কার্ফুতেও সমগ্র পাহাড়ের রাস্তা–ঘাট–হাট–বাজার জনশূন্য থেকে আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ততাকে দেখিয়ে দেয়। এমনকী দুধ–জল প্রভৃতির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবাও বন্ধ ছিল। কলকাতা হাইকোর্ট জনতা কার্ফুকেও বেআইনি ঘোষণা করে। রাজ্য সরকারের তরফে পাহাড় জুড়ে থানা, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি থেকে রেশন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় ১৩ তারিখ। পাহাড়বাসী তা প্রত্যাখ্যান করে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত কিছু সরকারি বাস চালানোও হয়।

জনমুক্তি মোর্চা ১৫ থেকে ১৮ আগস্ট বনধ্ স্থগিত রাখার ডাক দেয়। কিন্তু লোকমুখে প্রচারিত হয়ে যায়, কেবল ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের জন্য বনধ্ বা জনতা কার্ফু স্থগিত রাখা হয়েছে। পরদিন থেকে ফের শুরু হবে। কালিম্পং থেকে দার্জিলিং — সব জায়গাতেই মানুষ টানা বনধ্ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় নিজে থেকেই। পোস্টার পড়ে টানা বনধ্ চালানোর পক্ষে। জনমুক্তি মোর্চার পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ১৬ আগস্টের সর্বদলীয় বৈঠকে ঠিক হবে। বৈঠকের আগে ১৫ আগস্ট গোর্খাল্যান্ড টাস্ক ফোর্স সহ কয়েকটি সংগঠন প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়, গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের জন্য টানা আক্রমণাত্মক কর্মসূচি থেকে সরে আসার কোনো প্রশ্নই নেই এবং অবিলম্বে জিটিএ বাতিল করতে হবে।

গোর্খাল্যান্ডের দাবি ১০৭ বছরের পুরনো। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসার কোনো লক্ষণই পাহাড়বাসী দেখায়নি কোনোদিন। একের পর এক নেতা ও সংগঠন তৈরি হয়েছে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে। কখনও তার নাম সিপিআই, কখনও জিএনএলএফ, কখনও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা।

প্র থ ম পা তা র প র

আব্বা বাড়িক নাই

এইবারই প্রথম সুপারির বস্তা ভারত থেকে বাংলাদেশে পার করবার ঝুঁকি নিয়েছিল। আর তার পরিবর্তে জুটেছে একপিঠ রবার বুলেট, আর জেলখানার বন্দী জীবন।

আরবাজের মুখে একটা কথা শুনে অবাক হলাম। যে রবার বুলেটও শরীর ফুঁড়ে ঢুকে যায়। রক্ত ঝরায়। ও বলল, আব্বার যে জামাটা তিন্ডি গেইছে, গোটা জামাটা রবারের গুলি ফুটো হইছে। আরবাজের বাবার দায়িত্ব ছিল শুধু এপার থেকে ওপার করা। তার বিনিময়ে কিছু টাকা পেত। আর যে মহাজনের সুপারি সে বাড়িতে দিব্বি সুখে আছে।

দিল্লিতে কাজ করার জমানো টাকা দিয়েই খানিক চলছিল। কিন্তু কতদিন আর চলে? ভাঁড়ারে টান পড়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলে আরবাজ। ভোরবেলা উঠে পচা পাটের আঁশ ছাড়াও (পোষ্টা ঢুবার যায়), আর তার বিনিময়ে মেলে শুধু ছাড়ানো পাটকাঠিগুলো। ন–টায় বাড়িতে ফিরে স্নান করে স্কুলে আসে। এখন ওদের পরিবারে উপার্জনের নিশ্চয়তা নেই। নেই খাবারের নিশ্চয়তাও। মিড ডে মিলের বেল বেজে উঠল। আরবাজ বলল, মুই খাবার জাম?

সকলের সাথে আরবাজও খেতে বসল। আর আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রবার বুলেট ঢুকে যাওয়া একটা ঝলসে যাওয়া রক্তাক্ত পিঠের ছবি স্থির হয়ে রইল।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 5 Issue 4 16 August 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

ঈদের খুশি বাঁধ ভেঙেছে

জিতেন নন্দী, মেটিয়াবুরুজ, ১০ আগস্ট •

প্রতিবছর ঈদের দিনটায় আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সকালবেলায় নামাজের পর সাদা পোশাক পরা দলে দলে মানুষ দেখতে। আজকাল অবশ্য অনেককে রঙিন পোশাকও পরতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ক্যাটক্যাটে গাঢ় রঙের ধুতি ইত্যাদি পরা আর পাঞ্জাবির ওপরে গলায় একটা রঙচঙে গামছা — বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।

আজ ঈদের পরদিন দুপুরবেলায় সন্তোষপুর স্টেশনে গিয়েছিলাম ট্রেন ধরতে। কত ছেলেমেয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে আনন্দ করতে। সকলের পরনে নতুন পাটভাঙা পোশাক। চারদিক থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে আসছে। একটাও গানের কলি বোঝা যাচ্ছে না বটে, তবে জমাটি মিউজিকটা শুনতে অসুবিধা হচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মের ওপর এমনিতেই সারি সারি দোকান, একটা পুরোদস্তুর বাজার। ঈদের আগে আরও কয়েক ডজন দোকান খোলা হয়েছে। তবে দুপুরবেলায় অনেক দোকানই ফাঁকা। কদিন দিনরাত বিক্রিবাটা হয়েছে। এখন সকলেরই বিশ্রাম আর পরবের আনন্দ করার সময়।

২নং প্ল্যাটফর্মে একটা দোকানে ছোট্ট একটা ছেলে লাচ্ছা বিক্রি করছে। পিছনে মশারি খাটিয়ে দোকানদার ঘুমে কাদা। আমার পরিচিত শহীদুলের পাত্তা নেই, ওর দোকানের চৌকিটা তুলে দাঁড় করানো আছে। কদমগাছের তলায় যে মহিলা পেয়ারা বিক্রি করেন, অন্যদিন ডালায় থাকে বিশ-পঞ্চাশটা পেয়ারা। আজ ডালার পাশে একটা বড়ো ঝুরি বোঝাই পেয়ারা। মহিলা হাঁকছেন, তিনটাকা-চারটাকা, দশটাকায় চারটে। কেউ ডালা থেকে পেয়ারা বেছে নিয়ে কিনলেই মহিলা সেটা চার টুকরো করে কেটে একটু ঝাল-নুন লাগিয়ে ক্রেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন। মহিলাকে দেখলে বয়স বোঝা যায় না, রোগা শক্ত-সমর্থ চেহারা। একবার একজন মাঝবয়সি লোক পেয়ারা কিনে তাঁকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। কী গো তোমার ঘরে কে কে আছে? কোথায় ঘর? এইসব খেজুরে আলাপে মহিলা শুকনো গলায় জানালেন, ওঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তার বাচ্চাকাচ্চাও আছে। লোকটা একটু দমে গেলেন। আর এগোলেন না। একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলের জন্য ওর বাবা পেয়ারা কিনে মায়ের হাতে দিলেন। ওর মা পেয়ারার একটা টুকরো বাচ্চাটার হাতে তুলে দিলেন, সেটা পড়ে গেল। আর একটা দিলেন, সেটাও হাত ফস্কে পড়ে গেল। তৃতীয় টুকরোটাও পড়ে গেল। বাবা রীতিমতো মায়ের ওপর বিরক্ত। অবশেষে শেষ টুকরোটা হাতে ধরে বাচ্চাটা মুখে দিল, মায়ের স্বস্তি!

সব ট্রেনই আজ লেটে চলছে। মাঝে একটা মালগাড়ি চলে গেল। দূরে মালগাড়িটা আসছে আর এক-একটা ছেলে লাইন টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠছে। ট্রেনটা একেবারে সামনে চলে এসেছে, তখনও কেউ কেউ ১নং প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনলাফে ২নং প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ছে। ওদের বাহাদুরিকে মোটেই তারিফ করতে পারি না, বরং বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে।

এরই মধ্যে একজন স্বামী-স্ত্রী তাঁদের তিন ছেলেকে নিয়ে আসছেন। মা বড়ো ছেলেটাকে একটা ঝাপ্পড় দিলেন। বাপটাও কষিয়ে আর এক ঝাপ্পড় — আমি আটকাতে যাই, 'কী করেন, পরবের দিনে কেউ বাচ্চাকে মারে?' বাচ্চাটা অবশ্য নির্বিকার, নিজের আনন্দে মশগুল। বাঁ হাতের কব্জিতে একটা খেলনার ঘড়ির ব্যান্ড আটকাতে সে তখন ব্যস্ত! ট্রেন স্টেশনে ঢোকে। ভিড়ে ঠাসা প্রত্যেকটা কামরা। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা চলেছে ঈদের খুশিতে আনন্দ করতে করতে। উঠতি বয়সের ছেলেরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। কতগুলো মেয়ে দারুণ সেজেছে, চারপাশে যা দেখছে তাতেই তারা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তবে প্রত্যেকে অপরকে ধরে আছে, পাছে কেউ দলছুট হয়ে পড়ে।

ফেরার পথে সন্ধ্যায় আরও ভিড়। নিত্যযাত্রীরাও আছে। লেক গার্ডেন্স স্টেশনে উঠল 'মহাশক্তি তেল, করে নাকো ফেল'। উঠেই আমাদের পরিচিত তেল-মলম বিক্রেতা পেটেন্ট ডায়ালগ শুরু করে দিলেন। একটা বাচ্চা ছেলেকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে বাবু, কোথায় গিয়েছিলি?' — নিকো পার্ক। আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে — নিকো পার্কে কত টিকিট? ও জানে না। সামনের সিটে ওর চেয়ে একটু বড়ো একটা বাচ্চা ছেলেকে বলল, 'দাদু নিকো পার্কে যাবে, টিকিটের দাম বলে দে'। নিকো পার্কে ঢুকতে লাগে একশো টাকা। সায়েন্স সিটিতে ত্রিশ টাকা। তবে নিকো পার্কে ভালো করে ঘুরতে নাকি দু-তিনহাজার টাকা খরচ। ওরা সকালে বেরিয়ে নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি ঘুরে ফিরছে।

পরবের বাঁধ ভাঙা আনন্দ দেখতে ভালোই লাগে। ফেরার পথে শিয়ালদা স্টেশনে দেখছি রজনীগন্ধার চারা বিক্রি হচ্ছে, দশটাকা গোছা। কেউ কেউ তা হাসি মুখে কিনে নিচ্ছে, পরবের এই একটু ফুরসত, এই বর্ষায় চারাগুলো ঘরের পাশে লাগিয়ে দিলে সাদা রজনীগন্ধা ফুটে উঠবে। তাতেও আনন্দ।

তবে উঠতি বয়সের ছেলেরা যখন রাস্তায় হুঙ্কার দিতে দিতে মোটরবাইকে হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে হাত ওপরে তুলে ঝড়ের মতো পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। এতখানি বাঁধ ভাঙা আনন্দ সইতে পারি না, শিউরে উঠি ভয়ে।

নতুনহাটের মেছুড়ে জয়নালের কীর্তি

শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াবুরুজ, ১৮ জুলাই •

মাছ ধরার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ মাছ ধরার বিদ্যেয় হাত পাকিয়েছে, পেটের খিদে মিটিয়েছে। একটা সময় মানুষের যথেষ্ট অবসর ছিল আর বাঙলায় ছিল অসংখ্য খাল-বিল-পুকুর-জলাশয়। ছিল পুকুর পাড়ে বসে নিশ্চিন্তে মাছ ধরা। তাই আজও মুখে মুখে ফেরে এই প্রবাদ — 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে, লিখিব পড়িব মরিব দুখে'। সুস্বাদু, পুষ্টিকর, সহজলভ্য মাছ বরাবরই স্থান পেয়েছে বাঙালির খাদ্যতালিকায়।

ছিপ নিয়ে মাছ ধরার মধ্যে রয়েছে এক নান্দনিক ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন গড়িয়ার বোড়াল নতুনহাটের নামকরা মেছুড়ে জয়নাল খাঁ। মেছুড়ে জয়নালকে বহুদূর থেকেই লোকে চেনে। তাঁর পুরো নাম জয়নাল আবেদিন খাঁ। কলকাতার বউবাজারে উমাচরণ কিংবা কাস্টুর মশলার দোকান, গার্ডেনরীচ বাঁধাবটতলার বাবলুর মশলার দোকানে খোঁজ নিলেই জানা যায় মেছুড়ে হিসেবে তাঁর খ্যাতির কথা। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায় তিনি বেশি পরিচিত। এইসব জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছিপে মাছ ধরার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। কলকাতার লালদিঘি, বেলেঘাটার ঝিল, মেটিয়াবুরুজের কয়লাপুকুর, আদমার জলা, সত্যপীর পুকুর, ঠুঁটোর কলে নাটা কার্তিকের পুকুরে মাছ ধরার সূত্রে জয়নালের পরিচিতি ছড়িয়েছে।

আলাপচারিতায় জানা গেল, তিনি ১৬ বছর বয়স থেকেই মাছ ধরা শুরু করেছিলেন। পাস পুকুরে মাছ ধরার জন্য অধিকাংশ সময় তাঁকে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হত। ওঁর ফি ছিল সে যুগে ৫০০ টাকা। মশলা নিজের হাতে তৈরি করতেন। পার্টির কাছে মশলার দাম আলাদা নিতেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৭ বছর। চোখে অসুবিধার কারণে তিনি এখন আর মাছ ধরতে যান না। তবে মশলা তৈরি করে সাপ্লাই করেন। ৩১ মে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন সকালবেলা মেটিয়াবুরুজ থেকে তিনজন লোক তাঁর কাছে মশলা কিনতে গিয়েছিল।

মাছ ধরা যে একটা শিল্প তা তিনি বহু জায়গায় প্রমাণ করেছেন। হলুদ গেঞ্জি আর সাদা হাফ প্যান্ট পরে মাছ ধরতেন জয়নাল খাঁ। ভয়ে তাঁর পাশে কেউ মাছ ধরতে চাইত না। একবার বড়তলা রেললাইনের নিকটবর্তী বিশাল পুকুর আদমার জলায় রীতিমতো সাইনবোর্ড টাঙিয়ে জয়নাল খাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, নাম ছড়াবার জন্য আগে লোকে পুকুরে পাস দিত। এখন পুকুরে পাস দেওয়া হয় ব্যবসার জন্য, অনেকটা পেটের দায়ে লোক ঠকানোর জন্যও। এক্ষেত্রে মিথ্যা প্রচারও করা হয়ে থাকে।

একবার বিষ্ণুপুর মিশনের পুকুরে তৎকালীন গায়িকা-নায়িকা শ্রাবন্তী মজুমদারের সঙ্গে তিনি মাছ ধরেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর শ্রাবন্তী দেবী ওঁকে ডেকে বললেন, 'দেখুন তো চারে মাছ আছে? খাচ্ছে নাই বা কেন?' জয়নাল খাঁ পনেরো মিনিটের মধ্যে দুটো পাঁচ কেজি ওজনের মাছ ধরে দিয়েছিলেন ওই চার থেকে। সেদিন দারুণ গর্ব হয়েছিল তাঁর। আজও সেকথা মনে আছে।

চারে কী মাছ রয়েছে, কতক্ষণ পর টোপ খাবে, কত বড়ো সাইজের মাছ, বলে দিতে পারতেন তিনি। টোপে স্ট্রোক দেওয়া দেখে তিনি মাছের জাত বলে দিতেন। অনেকে বলত, এটা যাদুমন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকী একবার সংগ্রামপুরে তাঁকে তাঁর প্রিয় হলুদ গেঞ্জি আর সাদা হাফপ্যান্ট খুলিয়ে শুধু গামছা পরে মাছ ধরতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে রোখা যায়নি। সেখানেও তিনি সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। শোয়ে মাছ ধরার ওস্তাদ ছিলেন। শোয়ে বলতে জলের সমান বহরে বড়ো ফাতনাকে শুইয়ে মাছ ধরা।

তাঁর কথায়, মশলা তৈরি করতে বেশ পরিশ্রম দরকার। খোল, একাঙ্কি, ঘোড়বন্ধ, আওবেল, ছোটো মেথি ১০০ গ্রাম করে নিয়ে লতাকস্তুরি ২০০ গ্রাম, ঘিয়ের গাদ ২ কেজি, এক কেজি মাখন গাদ, খাঁটি চোলাই ২০০ গ্রাম ইত্যাদি একসঙ্গে মেখে ফেলে শুঁড়ো করে জারে ভরে রোদ্দুরে রাখতে হবে। এই চার রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের জন্য। কিন্তু কাতলা মাছ ধরার স্পেশাল একটা মশলা আছে — ২০০ গ্রাম চালের ভাত পোলাও, ৫০০ গ্রাম ছাতু পোলাও, ১০০ গ্রাম ঘি, ১০ গ্রাম ছোটো এলাচ, ১০ গ্রাম জয়িত্রি, ২০০ গ্রাম নারকেল তেল, খানিকটা মাখন গাদ দিয়ে চার তৈরি করা হলে ছিপে মাছ উঠবেই — প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেন জয়নাল। এছাড়া কাতলা মাছের টোপে দুরকমের পোলাও কিছুটা নিয়ে রুটির টোপের সঙ্গে মিশিয়ে নরম করে ফেললে কাতলা আনন্দের সঙ্গে খাবে।

জয়নাল খাঁর একটা আফশোস থেকে গেছে। তিনি বিশাল বড়ো মাছ ধরতে পারেননি। তবে এক জায়গায় একই দিনে ২৪ কেজি ওজনের দু-দুটো কাতলা মাছ ধরার রেকর্ড ওঁর আছে। একদিনে তিনি ৫ মণ মাছও ধরেছেন। পাস পুকুরে অন্যদের চেয়ে পরে বসেও খুব কম হলেও ৬০-৭০ কেজি মাছ ধরেছেন।

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের একটি অভিজ্ঞতা

সুদাম দাঁ, ১ আগস্ট •

সাধারণত আমরা যারা ভোট নিতে যাই, আগে ভাগে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখি — যা হবে দেখা যাবে। এই মনোভাব নিয়েই এ বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়ার সাঁকরেল ব্লকে নলাপুরের একটি কেন্দ্রে প্রথম পোলিং অফিসার হিসাবে যাই। চারটি বুথ। দুটোতে ১০০০-এর বেশি ভোটার আর দুটিতে ৫০০-এর কম।

সাধারণত একটু গ্রামের দিকে ভোট কর্মীরা কোনো পোলিং বুথে গেলেই একটা উৎসব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ওখানে আগের দিন সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। কোনো দলের এজেন্টদেরও দেখা গেল না। এলাকায় আসার সময় এমন কিছু দেখিনি, যা দিয়ে বোঝা যায় যে এখানে ভোট হতে চলেছে। স্টেশন থেকে ১৫-১৬ মিনিটের দুরত্বের হাঁটা পথে কয়েকটি ফলের দোকান চোখে পড়ল মাত্র। মনে ভাবলাম, রোজার মাস, তাই হয়তো একটু ফাঁকা ফাঁকা। সন্ধ্যে ছ-টা নাগাদ পৌঁছে দেখলাম কোনো খাবারের দোকান খোলা নেই। অগত্যা সম্বল বাড়ি থেকে বয়ে আনা যা কিছু খাবার ছিল, তাই।

ভোটের দিন সকাল ছ-টার মধ্যে রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা এসে হাজির। শান্ত ভোট। একে একে ভোট দিচ্ছে, চলে যাচ্ছে। বোরখা পরে এলেও কেউ নজর দিচ্ছে না। বেশিরভাগ ভোটারই টিপ সই দিচ্ছে। কিছু মহিলা পুরুষ অবস্থাপন্ন ঘরের, তারাও অনেক কষ্টে নাম লিখছে, পদবি বাদ। আশ্চর্য, মাত্র চারজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সই করল। দুজন মহিলা, দুজন পুরুষ। এজেন্টদেরও একই অবস্থা। মোট পোলিং হল ৩৯৯। গ্রামের একশো জনের মতো ভোটার বাইরে কাজে গেছে, আসতে পারেনি।

খবরে দুনিয়া

দস্তানা কারখানার দূষণ কুয়োর জলে, শ্রীলঙ্কার প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের ওপর নামল মিলিটারি!

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৭ আগস্ট, সূত্র ওয়ার্ল্ড সোস্যালিস্ট ওয়েবসাইট •

শ্রীলঙ্কার পশ্চিম প্রদেশের গামপাহা জেলার উইলিউইরিয়াতে গ্রামবাসী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত তিনজন গ্রামবাসী মারা গেছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করছিল, তাদের পরিষ্কার খাবার জলের কুয়ো একটি রাবার গ্লাভস তৈরির কারখানার বর্জ্যে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। ওই দস্তানা তৈরির কারখানার নাম, ভিনোগ্রস ডিপ প্রডাক্টস। এই কারখানার মালিক শ্রীলঙ্কার অন্যতম বড়ো কর্পোরেট গ্রুপ হ্যালেস। দেশটির রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই কর্পোরেটের খুবই দহরম মহরম।

বেশ কয়েকদিন ধরেই গালোলুয়া, নাদুগামা, রাথুপাসুয়েলা, উরুয়েলা, কাতুরুওয়াট্টা, কিরিকিথা, এবং আমবারালুয়া গ্রামের গ্রামবাসীরা এই কারখানাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছিল। ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার প্রায় পাঁচ হাজার গ্রামবাসী (পুরুষ, মহিলা এবং শিশু) উইলিউইরিয়া, বেলুম্মাহারা এবং রাথুপাসুয়েলার সংযোগস্থলে, কলম্বো-ক্যান্ডি মহাসড়কের ওপর অবস্থান শুরু করে। সড়ক অবরুদ্ধ হয়। পুলিশ তাদের সরতে বললেও তারা সরেনি। হাতে পোস্টার ছিল, 'আমরা অ্যাসিড-জল চাই না। শান্তি ফিরবে, যদি আমরা পরিষ্কার জল পাই'। এলটিটিই নিকেশকারী শ্রীলঙ্কান রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষ-র ডিফেন্স সেক্রেটারি গোটাভায়া রাজাপক্ষর নেতৃত্বে আদেশ আসে, জলের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর মিলিটারি নামানো হোক।

ব্যস্, টি-৫৬ রাইফেল হাতে নিয়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে এক হাজার সেনা মোতায়েন করা হয় ওই এলাকায়। তামিল বিদ্রোহী এলটিটিই-র বিরুদ্ধে কয়েকবছর আগে জিতে আসা শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনীর মোটরসাইকেল ব্রিগেডও চলে আসে বেলুমাহারার দিক থেকে। ঘন্টা দুয়েক পরে বিকেলের দিকে উইলিউইরিয়ার দিক থেকে আরও সেনা আসে। গ্রামবাসীরা এক ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এলাকা খালি করে দিতে রাজি হলেও এরই মাঝে কমান্ডোরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তার সঙ্গে শুরু হয় জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ। রাতেও হামলা চলে। সন্ধ্যের দিকে এলাকার বিদ্যুতের সংযোগ কেটে দেয় মিলিটারি, এমনই অভিযোগ সংবাদমাধ্যম এবং গ্রামবাসীদের। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা চালাতে থাকে সেনাবাহিনী। ভীত জনতা পাশের একটি চার্চে আশ্রয় নিলে সেনাবাহিনী সেই চার্চেও ঢুকে পড়ে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। উইলিউইরিয়া এলাকা কার্যত সেনাবাহিনীর মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়।

ভিনোগ্রস ডিপ কারখানার এক প্রাক্তন শ্রমিক জানালেন, রাসায়নিক জল বর্জ্য হিসেবে বেরোয় কারখানা থেকে। তা শোধন করার বন্দোবস্ত নেই এখানে। তাঁর বক্তব্য, প্রতিদিন খোলা মাঠে ১৫,০০০ গ্যালন দূষিত জল ছাড়ে কোম্পানি। সেগুলি চুঁইয়ে মাটির নিচে চলে যায়। তারপর তা কুয়োর জলে গিয়ে মেশে।

এলাকার জল এতটাই দূষিত যে পান করা তো দূরের কথা, ওই জলে স্নান অবধি করা যায় না। গায়ে র‍্যাশ বেরোয়। নাদুগামার একজন জানান, অনেকের মৃত্যুর কারণ ওই জল।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, প্রতিবাদীরা সেনাবাহিনীর দিকে পেট্রোল বোম ছুঁড়েছিল। তবে চাপে পড়ে তদন্তের জন্য একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে।

মিশরে মোরসি সমর্থকদের ওপর সেনা সরকারের সশস্ত্র হামলা, একদিনে মৃত সহস্রাধিক

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ আগস্ট •

বাঁধভাঙা জনপ্রতিরোধের পর মিশরের নির্বাচিত মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা মুহাম্মদ মোরসিকে হটিয়ে আর্মি ক্ষমতায় এসেছিল, গঠন করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু মোরসির সমর্থকরা তা মেনে নেয়নি। হিংসাত্মক বিক্ষোভের পর আর্মি মোরসি সমর্থকদের ওপর অস্ত্র হাতে চড়াও হয়েছিল। তার প্রতিবাদে এবং মোরসিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চেয়ে কায়রো এবং গিজায় মোরসি সমর্থকরা ধরনায় বসে। গোটা রমজান মাস জুড়ে সেই ধরনা চলতে থাকে। মিশরীয় আর্মির সরকার একে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ও মিশরীয় সেনাপ্রধান সিসি ২৬ জুলাই কায়রোতে জনসমাবেশের ডাক দেয় সন্ত্রাসবাদকে নিকেশ করার পাবলিক সাপোর্ট দেখানোর জন্য। মোরসি সমর্থকদের ধরনা ভাঙতে সেনাবাহিনী যাতে বলপ্রয়োগ করে, তার জন্য ২৬ জুলাই লক্ষ লক্ষ মিশরবাসী রাস্তায় নামে। মিশরীয় মিডিয়া রাষ্ট্রীয় হিংসার এই তোড়জোড়কে সম্পূর্ণ সমর্থন দেয় এবং ২৬ জুলাইয়ের মিছিল সংগঠিত করতে বড়ো ভূমিকা নেয়। প্রায় সমস্ত ব্রাদারহুড বিরোধী সংগঠিত শক্তি মিছিলে যোগ দেয়। কেবল 'এপ্রিল ৬ যুব আন্দোলন' এবং আরও কয়েকটি ছোটো শক্তি, মোরসি-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্র এবং মিডিয়ার ডাকা এই মিছিলে যোগ দেয়নি।

২৭ জুলাই মিশরীয় সেনাবাহিনী মোরসি সমর্থকদের একটি প্রতিরোধ ক্যাম্প, রাবিয়া আল-আদাইয়া মসজিদে আক্রমণ চালায়। ৮৬ জন মারা যায়। কিন্তু কায়রো এবং গাজার ধরনা শিবির চলতে থাকে।

১৪ আগস্ট সেনাবাহিনী এই ধরনা শিবিরগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। মুসলিম ব্রাদারহুড সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক দেয়। ব্যাপক হিংসাতে ১৫ আগস্ট সকাল পর্যন্ত হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। মিশর সরকারের হিসেব, ৫২৫ জন মারা গেছে, যার মধ্যে ৪৩ জন পুলিশ অফিসার এবং চারজন সাংবাদিক। মুসলিম ব্রাদারহুড জানায়, ২০০০ প্রতিরোধকারী মারা গেছে। সামরিক সরকার একমাসের জরুরি অবস্থা জারি করে। রাজধানী কায়রোর ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, গোটা মিশর জুড়ে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং পুলিশ মিলিটারির খণ্ডযুদ্ধ চলছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থকরা কিছু চার্চ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
শমীক সরকার, ১১২ এইচ সেলিমপুর রোড, কলকাতা ৩১। দূরভাষ ০৩৩-২৪১৪৭৭৩০
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata 9. Published at B23/2 Rabindranagar, P.O. Bartala, Kolkata-18. Editor Shamik Sarkar